জগদীশচন্দ্র বসু

[১৮৫৮–১৯৩৭]

বিজ্ঞান তাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বাড়ীখাল গ্রামে। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

জগদীশচন্দ্র যে বাড়িতে থাকতেন, বাড়ির পাশ দিয়ে পদ্মার একটি শাখা নদী বেয়ে গিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র এই নদীর ধারে বসে থাকতে খুবই ভালবাসতেন। সমস্ত জীবনই তাঁর নদীর প্রতি আকর্ষণ ছিল। তাই পরবর্তীকাল তিনি গঙ্গার উৎস সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন।

স্থানীয় স্কুলে পড়া শেষ হলে ভগবানচন্দ্র জগদীশকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু ইংরেজীতে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় তিন মাস পর জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ভগবানচন্দ্র তখন বর্ধমানের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হল জগদীশচন্দ্রের। সেই সময় জগদীশচন্দ্রের বয়স এগারো।

ছাত্র হিসাবে জগদীশচন্দ্র ছিলেন যেমন মেধাবী, পড়াশুনায় ছিল তেমনি গভীর অনুরাগ। ষোল বছর বয়েসে জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন।

১৮৭৭ সালে বয়েসে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন। তিন বছর পর দ্বিতীয় বিভাগেই বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ পাশ করলেন। ১৮৮০ সালে জগদীশচন্দ্র বিলাতের পথে যাত্রা করলেন।

লন্ডনে গিয়ে ডাক্তারি পড়বার জন্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু মৃতদেহ কাটাকুটির সময় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। শেষে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। অবশেষে ১৮৮৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

ভারতে ফিরে আসার আগে ইংল্যান্ডের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে চিঠি লিখে দিলেন।

লর্ড রিপন তখন ছিলেন সিমলায়। তিনি বাংলার গভর্নরকে চিঠি লিখে দিলেন যাতে জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগে কোন ভাল পদ দেওয়া যায়। সেই সময় সাহেবদের ধারণা ছিল ভারতীয়রা বিজ্ঞান শিক্ষায় অনুপযুক্ত। সেই কারণে চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে নানা অজুহাত সৃষ্টি করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপনের আদেশে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হল। এই পদে ইংরেজ অধ্যাপকরা যে বেতন পেত, জগদীশচন্দ্রকে তার দুই-তৃতীয়াংশ বেতন স্থির হল। আবার অস্থায়ী বলে ঐ বেতনের অর্ধেক হাতে দেওয়া হত।

এই ব্যবস্থায় জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এই বৈষম্য দূর করবার জন্য তিনি প্রথমে প্রতিবাদ জানালেন। বাঙালী তরুণ অধ্যাপকের এই প্রতিবাদে কেউ কোন কর্ণপাত করল না। শেষে তিনি স্থির করলেন কোন বেতন নেবেন না। বেতন না নিলেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন।

১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র অবলা দাসকে বিয়ে করলেন। অবলা দাস ছিলেন বিদুষী উচ্চশিক্ষিতা। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়েছিলেন। যখন দুজনের বিয়ে হল তখন জগদীশ বসু কোন মাইনে নেন না। সংসারে অভাব অনটন।

অধ্যাপনার এক বছরের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাপত্র ইংলন্ডের রয়েল সোসাইটিতে পাঠালেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রকাশিত হল। রয়েল সোসাইটির তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া হল। এছাড়া লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. Sc. উপাধি দিল।

ইতিমধ্যে তিন বছর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কলেজে অধ্যাপনা করে গেলেন। তাঁর এই অসহযোগ আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জগদীশচন্দ্রকে শুধু যে ইংরেজ অধ্যাপকের সমান বেতন দিতে স্বীকৃতি হল তাঁর তিন বছরের সমস্ত প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হল। এই অর্থে পিতার সমস্ত দেনা শোধ করলেন জগদীশচন্দ্র।

গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই জগদীশচন্দ্র ইলেকট্রিক রেডিয়েশন বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ছিল, "বিদ্যুৎ-উৎপাদক ইথার তরঙ্গের কম্পনের দিকে পরিবর্তন" এই প্রবন্ধটি তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পেশ করেছিলেন। এর পরের প্রবন্ধগুলি ইংল্যান্ডের "ইলেকট্রিসিয়ান" পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই সময় জগদীশচন্দ্র বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে শব্দকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিভাবে পাঠানো যায় সেই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন, আমেরিকায় বিজ্ঞানী লজ, ইতালিতে মার্কনী। জগদীশচন্দ্র ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী।

১৮৯৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম এই বিষয় পরীক্ষা করেন। কলকাতার টাউন হলে সর্বসমক্ষে এই পরীক্ষা করেন।

এর পরে তিনি বিনা তারে তাঁর উদ্ভাসিত যন্ত্রের সাহায্যে নিজের বাসা থেকে এক মাইল দূরে কলেজে সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। এই কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি পশ্চিমে যাত্রা করলেন।

১৮৯৬ সালে তিনি এক বছরের ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন। প্রথমে সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত গভর্নর তাঁকে গবেষণার জন্য ইংল্যান্ডে যাবার অনুমতি দিলেন।

Wirelcss telgraphy সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার ইংল্যান্ডে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "একটি বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানি আমার পরামর্শ মত কাজ করে Wirelcss telgraphy বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছেন আমি আর একটি নূতন পেপার লিখিয়াছি তাহাতে Practical Wirelcss telgraphy-র অনেক সুবিধা হইবে।"

অর্থনৈতিক কারণে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ব্যাহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৯৬ সালে মার্কনী Wirelcss telgraphy-র প্রথম পেটেন্ট নিলেন।

ব্রিটেনে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

লন্ডনে থাকার সময় জগদীশ অনুভব করলেন বিলাতে বিজ্ঞানীরা কত আধুনিক গবেষণাগারের সুযোগ পাচ্ছে। তাঁর অনুরোধে লর্ড কেলভিন ও অন্য বিজ্ঞানীরা ভারত সচিবের কাছে গবেষণার সুযোগ প্রদান করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

ভারতবর্ষে এসে তিনি এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন, মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি আধুনিক ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল।

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ প্রবাস জীবন যাপন করার পর ভারতবর্ষে ফিরে এলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন সেই সাথে গবেষণা। এই সময়েই তাঁর উদ্ভিদ বিষয়ক যুগান্তকারী গবেষণা আরম্ভ করেন।

১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ডাক এল জগদীশচন্দ্রের। জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্র প্যারিসে পৌছবেন। এখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "জীব ও জড়ের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একত্বতা।"

ফ্রান্স থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন ইংলন্ডে। সেখানে জীব ও জড়ের সম্পর্ক বিষয়ে ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় বক্তৃতা দিলেন।

১৯০২ সালে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে এসে রচনা করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "জীব ও জড়ের সাড়া" (১৯০২) (Responses in the living and non living) ১৯০৬ সাল প্রকাশিত হল তাঁর আর একটি গ্রন্থ "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Responses 1906) ।

এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে কোনভাবে উত্তেজিত করলে তা থেকে একই রকম সাড়া পাওয়া যায়।

এই সময় ইউরোপ থেকে ডাক এল। তিনি প্রথমে গেলেন ইংল্যান্ড, সেখান থেকে আমেরিকা। বিশেষত আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট কৌতূহলী তাছাড়া ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী মহলও ধীরে ধীরে গবেষণার সত্যতাকে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন।

দেশে ফিরে এসে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের গবেষণা শুরু করলেন, "উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহকলার মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা"। এই সময় তিনি উদ্ভাবন করলেন তাঁর বিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর অতি সূক্ষ্মতম সঞ্চালনকেও বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেখানো সম্ভবপর।

ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে তাঁর একাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে তিনি চতুর্থবারের জন্য ইংল্যান্ড গেলেন। এইবার যাত্রার সময় তিনি সাথে করে শুধু যে তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলেন তাই নয়, তাঁর সঙ্গে ছিল লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ। এই গাছগুলি সহজেই সাড়া দেয়।

তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এছাড়া রয়েল সোসাইটিতেও তাঁর উদ্ভাসিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলেন, জীবদেহের মত বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, তারাও আঘাতে উত্তেজনায় অনুরণিত হয়।

১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময় ছিল, কিন্তু তাঁর চাকরির মেয়াদ আরো দু'বছর বাড়ানো হল। ১৯১৫ সালে সুদীর্ঘ ৩১ বছর অধ্যাপনা করবার পর চাকরি জীবন থেকে অবসর নিলেন।

চাকরি জীবন শেষ হলেও তাঁর গবেষণার কাজ বন্ধ হল না। তিনি ইংল্যান্ডে থাকার সময় লন্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে যদি এই ধরনের একটি গবেষণার কাজে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

তিনি তাঁর পরিচিত জনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

এবার এই কাজে এগিয়ে এলেন দেশের বহু মানুষ। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীচন্দ্রচন্দ্র নন্দী দুই লক্ষ টাকা দিলেন। এছাড়া বম্বের দুই ব্যবসায়ী মিঃ এস আর বোমানজী দিলেন এক লক্ষ টাকা। মিঃ মূলরাজ খাতা সোয়া লক্ষ টাকা দিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে অর্থ সঞ্চয় করলেন, এইভাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা সংগৃহিত হল। জগদীশ নিজের সমস্ত জীবনেরর উপার্জন পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন।

সরকারের তরফেকে বার্ষিক অনুদান হিসাবে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হল। এবং জমি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে সাহায্য করা হল। অবশেষে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের ৫৯তম জন্মদিনে প্রতিষ্ঠা হল বিজ্ঞান মন্দির।

জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার।

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য জেনেভা গেলেন। জেনেভাতে অভূতপূর্ব সম্মান পেলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর গবেষণা দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্র পৃথিবীকে যে সব অমূল্য উপহার দিয়েছেন তার যে কোন একটির জন্যই বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

পরিণত বয়সে তিনি বেরিয়ে পড়েন পল্লার উৎস সন্ধানে। তাঁর এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা

দিয়েছেন অপূর্ব ভাষায় 'অব্যক্ত' গ্রন্থে বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিক জগদীশ একাকার হয়ে গিয়েছেন। বাংলা গ্রন্থ আর লেখা হয়নি।

বয়স বাড়বার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন জগদীশচন্দ্র।

গবেষণার কাজ ছেড়ে দিলেও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাজ নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। মাঝে মাঝে দার্জিলিং যেতেন। জীবনের শেষ চার বছর কয়েক মাসের জন্য গিরিডিতে চলে যেতেন। ১৯৩৭ সালে তিনি তখন গিরিডিতে ছিলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন,২৩শে নভেম্বর সকালের গোসলের সময় অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর হৃদয়স্পন্দন চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

জগদীশচন্দ্রের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর স্ত্রী অবলা দাস সব কিছু বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে দান করে যান।

Jogodish Chondro Bosu, www.banglainternet.com